১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বীরাঙ্গনা কাব্যের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' কবিতার কাব্যশৈলী বিচার করো।

'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্র। এ পত্রের কাহিনির উৎসসূত্র মহাভারত ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক। কাব্যে মহাভারত ও শকুন্তলা নাটকের ভাব ও ভাবনার স্বচ্ছন্দ অনুপ্রবেশ ঘটলেও কবি আখ্যান নির্মাণ ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের নাটকে তৃতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে লেখা শকুন্তলার প্রেমপত্রের কথা কবির অজ্ঞাত ছিল না। তবে একাব্যে শকুন্তলার পত্র-রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মহাভারত ও কালিদাসের নাটক থেকে আমরা জেনেছি রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে তাকে কণ্বমুনির তপোবনে রেখেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘদিন যাবৎ পত্নীর আর কোনো তত্ত্বাবধান করেননি। কালিদাস 'দুর্ব্বাসার অভিশাপ' নামক কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে ভোগী রাজার ঔদাসীন্যকে কিছুটা শোভনতার আড়ালে রাখতে চাইলেও মধুসূদন তাকে গুরুত্ব দেননি , বরং রাজার এই ঔদাসীন্যে উপেক্ষিতা নারীহৃদয়ের যন্ত্রণা ও উদ্বেগ থেকেই শকুন্তলাকে দিয়ে এই পত্র রচনা করিয়েছেন।

শকুন্তলার পত্রটি মূলত 'স্মরণ' অনুসঙ্গ ভিত্তিক। এককথায় একে শকুন্তলার 'visioris of the post' বলা চলে। তবে গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা শকুন্তলা রাজমহীষীর সম্মান তখনো পাননি। দুষ্মন্তের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যই রাজকুলবধূর প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিতা হয়ে তিনি আজ তাত কণ্বের আশ্রমে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রিয়তম কর্তৃক পরিত্যক্তাতে হওয়ায় দুষ্মন্তের প্রতি অভিমান বশত পত্রটিতে অসহায়া নারীর মৃদু অনুযোগের সুরও কিছুটা যুক্ত হয়েছে। সমগ্র পত্রটিতে শকুন্তলার অন্তর্বেদনা ও অভিমান ব্যক্ত করবার জন্য কবি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেছেন।

প্রথম স্তবকেই দেখি তপোবনবাসিনী শকুন্তলা নিজেকে দাসীরূপে নিবেদন করে রাজেন্দ্র দুষ্মন্তকে প্রণাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেছে। এই স্তবকের মূল বিষয়টি হল আশামদে মত্ত শকুন্তলার

দুষ্মন্তের জন্য প্রতীক্ষা এবং সর্বদা প্রাণনাথের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে ধূলারাশি উত্থিত হতে দেখে , বাতাসের শব্দ শুনে রত্নালংকৃতা হস্তীসহ রাজার বনে পুনঃপ্রবেশ ঘটেছে বলে তার মনে ভ্রমের সৃষ্টি। এভাবে পত্রের সূচনা থেকেই কবি তাঁর বক্তব্যকে সংলাপাশ্রয়ী করে তোলবার জন্য নায়িকার কথক সত্তাকে বিভাজিত করে দেখিয়েছেন। এই বিভাজনের ক্ষেত্রে নায়িকার দ্বৈত সত্ত্বার এক অংশ অপর অংশকে বিপরীত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রমবশত শকুন্তলাকে নিকুঞ্জবনে ছুটে যেতে দেখা যায়। সেখানে পূর্বের মতোই মুকুলিত লতা, কোকিলের গীত, কপোত-কুজন, অলি গুঞ্জন সবই আছে, কিন্তু যে পদযুগল দেখবার আশায় সে ব্যাকুল ভাবে সেখানে ছুটে উঠেছে। সেই কেবল অনুপস্থিত। আর এবারই তার ভ্রম ভাঙে। তার চোখ জলে ভেসে যায় , স্বামী বিরহে নিকুঞ্জবনের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য শকুন্তলার মনে সৃষ্টি করে অন্য এক উপমা। গাছের পাতার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে সে বলে ওঠে। কবি বলেছেন- শোন, পত্র সরস দেখিলে সমীরণ আসি নাচে লয়ে প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে/তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;/তেমনি দাসীর কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?

পরের স্তবকেও এরই পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় স্তবক পর্যন্ত সবটাই যেন শকুন্তলার স্বপ্নচারণা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভরা তাছাড়া , প্রকৃতির বেদনা ও শকুন্তলার মনোবেদনা উভয় যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই স্তবক পর্যন্ত।এরপরে শকুন্তলার স্মৃতি রোমন্থন অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

দুষ্মন্তের প্রতি বিরহজনিত উভয়ের মর্মোচ্ছ্বাস-এর প্রকাশ। ষষ্ঠ স্তবকে কবি শকুন্তলাও দুষ্মন্তের মিলন প্রসঙ্গ উল্লেখের সময় থেকে একেবারে শেষ স্তবক পর্যন্ত দেখেছি এরই ক্রমিক বিকাশ। তার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধাব বিবাহ ও নিকুঞ্জে ফুলশয্যার কথাও বলেছেন। শকুন্তলার জীবনের সব সুখশান্তি নষ্ট করে চলে যাবার জন্য দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার মৃদু অনুযোগ-এর দিকটিও রয়েছে।

দ্বাদশ স্তবকে প্রদত্ত আত্মপরিচয় অংশে শকুন্তলার মধ্যে দুষ্মন্তের প্রতি আত্মনিবেদনের ভাবটি প্রধান হয়ে উঠেছে। নিজেকে সে বারবার বন-নিবাসিনী দাসী , অভাগী, পাগলিনী, অনাথিনী, অবলা বলতে চেয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করলেও স্বামী পরিত্যক্ত অবহেলিতা শকুন্তলা নিজের পত্নী

পরিচয় গুরুত্ব দিয়ে দাসী শব্দটি প্রয়োগ করেছে মধুসূদনের সৃষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে সচেতন নারীর পক্ষে নিজেকে এভাবে দাসী বলে উল্লেখ করবার ঘটনাটি এজন্যেই কোথাও কোথাও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পক্ষে আপাতদৃষ্টিকে বেমানান বলে মনে হয়। হয়তো 'দাসী' বলতে শকুন্তলা নিজেকে রাজপদে অবনতা আত্মনিবেদিতা বলেই বোঝাতে চেয়েছে। এইভাবে শকুন্তলা 'বীরাঙ্গনা'-র অন্যান্য নায়িকাদের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। শকুন্তলাকে আমরা এখানে বিবাহিতা বলেই ধরে নেব (কারণ গন্ধর্ব বিবাহ-এর উল্লেখ পত্রে আছে)। সেদিক থেকে বীরাঙ্গনার অন্যান্য বিবাহিতা নারী যেমন কেকয়ী, জনা এরা তাদের স্বামীর অবহেলা, অবিচারকে নীরবে সহ্য না করে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ও শেষ পর্যন্ত স্বামীর পায়ে নতি স্বীকার না করে। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখতে চেয়েছে। কিন্তু শকুন্তলা তেমন নন।

পত্রটিকে নাটকীয় একোক্তিগুলির স্বাভাবিক ছাঁচকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ফলে ধরা পড়েছে বিশেষ শৈলীজাত কৌশল। সেক্ষেত্রে পত্রকাব্যগুলির কাব্যিক নাট্য ধর্মে ভেদরেখা অনেকটাই মুছে গেছে। গোটা পত্রকাব্যটি নিরবচ্ছিন্ন কোনো কাহিনিকে আশ্রয় করেনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে কবি একে একে মেনে ধরেছেন। ফলে কাহিনিতে নাটকের মতো flash back স্বপ্নচারণা ও আগামীদিনের সম্ভাব্য ঘটনার আবির্ভাব ঘটেছে। এই পত্রে যেমন — 'যে তরুর দলে/গন্ধর্ব্ব-বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে ,'। এই পত্রে মধুকবির লিপিচাতুর্যের প্রমাণও আছে। পত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুন্দর ব্যবহার এ পত্রের লালিত্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সোমের প্রতি তারা পত্রিকাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো।

আলোচ্য পত্রিকাটির সূচনাতেই দেখা যায় , সম্বোধন নিয়ে পত্র লেখিকার সবিশেষ সংকোচ সংকোচের কারণটি হল , প্রণয় ব্যাপারে পারস্পরিক সম্পর্কের বিরুদ্ধতা। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী হয়ে তারা প্রণয় ভিক্ষা করছেন বৃহস্পতির শিষ্য সোমের কাছে। সমাজ ও ধর্মের চোখে উভয়ের প্রেম অবৈধ ও নিন্দিত। কিন্তু হৃদয়াবেগ ও কাম প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে গুরুপত্নী তারা নিজেকে

কিছুতেই যেন সংযত রাখতে পারছেন না। অপরাধ জেনেও তিনি ভেসে চলেছেন কামনার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে।

চিঠির ভাষাতেও এই অসংযত কামনার গাঢ় রং। 'সুধাংশু সিধি, আমি গুরুপত্নী! তুমি পুরুষরত্ন! কী কপাল, সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে ইচ্ছে করছে তোমার পদসেবা করতে। খুবই লজ্জার কথা! পাপের কথা। জাতের এই পোড়া লেখনী একথা লিখছে কেমন করে তা ভাবলে শিহরিত হতে হয়। কিন্তু দোষটা কলমের ঘাড়ে চাপিয়ে কী লাভ ! বৃথা তাকে গঞ্জনা দেওয়া। মনের কথা লেখে কলম। তা মন পুড়লে কলমের কী দোষ ! সেও পুড়বেই! গাছের মাথায় বাজ পড়লে কেবল গাছ পোড়ে না, দগ্ধ হয়ে যায় তার পদাশ্রিত লতাও। এইভাবেই চন্দ্রের প্রতি তাঁর খেদোক্তি প্রকাশ করতে থাকে।

কুকর্মে রত দুর্বৃত্ত যেমন প্রথমেই নিভিয়ে দিতে চায় আলো, তেমনি স্মৃতিকে প্রথমেই আঁধারে ঢেকে দিতে চায় 'পাপিনী' তারা, সবই ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে চায় তারা , অতীত ভবিষ্যৎ সবই। ভুলে যেতে চায়, কে সে? কুল, মান, ধর্ম, লজ্জা, ভয়, সকল আজ তার কাছে তুচ্ছ , ফুলের খাঁচা ভেঙে কুল বিহঙ্গিনী বায়ুপথে উড়ে চলেছে। তারা অনুরোধ করেছে। 'তারানাথ' সোম এসে তাকে গ্রহণ করুন। 'ধর আসি তারে তারানাথ '। পদ্ম ফুলের বুকের গভীরে যেমন লুকিয়ে থাকে 'সৌরভ' সেইভাবে তারার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে ছিল সোমের জন্য ভালোবাসা , জ্বলন্ত আগুনকে যেমন গোপন করা যায় না, সেই ভাবে ওই ভালোবাসাকে শেষে লুকিয়ে গোপন রাখা গেল না। নীলধ্বজ কন্দপ যেভাবে জিতে নেয় তার 'পঞ্চঘর শর' হেনে অসহায় পুরী সেইভাবে তারাকে জিতে নিয়েছে পুষ্পধনু। এখন সোম ছাড়া কে তাকে বাঁচাবে?

তাই, 'সোমের প্রতি তারা ' পত্রিকাটিকে রোমান্টিক প্রেমের আলেখ্য হিসাবে বিচার করলে দেখা যায়–সংকোচ ও লজ্জার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে এটি সত্য সত্যই একটি সুন্দর কবিতা হয়ে উঠেছে, 'Dramatic Manologue'-এর অবসর নেওয়ায় এর ভেতর দিয়ে আশ্চর্য এক নারী কণ্ঠ শোনা যায়। এ নারী দ্বিধা ও সংশয়ে জর্জরিত হলেও , এ নারীর মধ্যে ভালোবাসার উদ্বেল উম্মতার অনুভব করা যায়। এ পত্রিকার 'তারা' যেন রক্তমাংসের একটি জীবন্ত চরিত্র। সমাজের বাঁধন কেটে সে তার প্রেমকে অবলম্বন করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে। সাহিত্য যদি Criticism of

life হয়, এই পত্রিকাটিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। জীবনের কথা এমন নির্মমভাবে আমাদের সাহিত্যে খুব কমই বলা হয়েছে। শত ধিক্কার সহ্য করেও তারা ভারত প্রেমকে ত্যাগ করতে পারেনি। এছাড়া শব্দের যথাযথ ব্যবহার , উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ এবং সেই নাটকীয় ভঙ্গি এই পত্রিকাটিকে 'বীরঙ্গনা' কাব্যে শ্রেষ্ঠ একটি পত্রিকায় পরিণত করেছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা' কবিতার কাব্যশৈলী বিচার করো।

আলোচ্য পত্রটির উৎসসূত্র বাল্মীকি রামায়ণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য পঞ্চবটী অরণ্যে নির্বাসিত বনবাসী লক্ষ্মণের যৌবন কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী শূর্পনখা তার প্রেমে পড়ে। আর তার প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যেই দশরকন্দন রামানুজ লক্ষ্মণকে এই পত্রটি লিখেছিন । মোট ৭টি স্তবক পত্রটি সমাপ্ত হয়েছে। পত্রিকাটি এক কুমারী হৃদয়ের প্রণয়জনিত রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা।

ওভিদের লেখা 'Heroides' কাব্যের সপ্তম পত্রের সঙ্গে এই পত্রিকার বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। ওভিদের রচনায় রাজা সিকাত্তশের বিধবা পত্নী রাণী ডিডো ভিন্নদেশী বিপন্ন রাজকুমার 'ইনিসে'র প্রেমে পড়ে এরূপ প্রেমাকুল অভিব্যক্তিতে তাঁর প্রেমপত্রটি লিখেছিলেন। মধুসূদন রচিত শূর্পনখা-র পত্রিকাতেও এই একই রকম রোমান্টিকতা চোখে পড়ে । তাছাড়া , রামায়ণ থেকে আমরা জেনেছি শূর্পনখাও ছিলেন এক বিধবা , যার স্বামী ছিলেন কালকের বংশের রাক্ষস-রাজ বিদ্যুৎজিহ্ যিনি যুদ্ধের সময় ভুলক্রমে রাবণের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এজন্য রাবণ তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিধবা ভগিনীর যথাসম্ভব মানসিক সুখ শান্তি উৎপাদনের জন্য দণ্ডকারণ্যে শূর্পনখার যথেচ্ছ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন, আর তখনই তার সামনে আবির্ভূত হয় বনচারী ভিনদেশী রাজকুমার লক্ষ্মণ। আর তাকে দেখেই তার রূপমুগ্ধা হয়ে পড়েন শূর্পনখা। রামায়ণের এই কাহিনি মধুসুদনের হাতে এসে এসে নতুন রূপ পেয়েছে।